প্রত্যক্ষ প্রমাণ
(Perception)

প্রত্যক্ষের লক্ষণ
(Definition of Perceptual Knowledge)

ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম তাঁর *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থে প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম-অব্যপদেশ্যম-অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্''। অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান হল সেই জ্ঞান যা ইন্দ্রিয় ও অর্থের (বিষয়ের) সন্নিকর্ষ হতে উৎপন্ন এবং যা অশাব্দ (অব্যপদেশ্য), অভ্রান্ত (অব্যভিচারী) ও নিশ্চয়াত্মক (ব্যবসায়াত্মক)। অন্নংভট্ট তাঁর *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হতে উৎপন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। এখানে 'ইন্দ্রিয়' শব্দের দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মনকে বুঝতে হবে। 'অর্থ' শব্দের দ্বারা সৎ বা বাস্তব পদার্থকে (real entities) বুঝতে হবে। 'সন্নিকর্ষ' শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে একপ্রকার সম্বন্ধকে বোঝায়। চক্ষুরাদি ছটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটির সঙ্গে কোন একটি বাস্তব পদার্থের সন্নিকর্ষ হলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ জন্য বলা হলেও ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের একমাত্র কারণ নয়। মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগও প্রতক্ষের কারণ। কিন্তু ঐগুলি অনুমানাদি জ্ঞানেরও কারণ বলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের

---

১৫. তর্কসংগ্রহ, অন্নংভট্ট।

১৬. ন্যায়দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫।

লক্ষণে ঐগুলি উল্লিখিত হয়নি। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানের যা অসাধারণ কারণ তাই উল্লিখিত হয়েছে। চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটের সংযোগ হলে ঘটের যে অভ্রান্ত ও নিশ্চিত জ্ঞান হয় তাই প্রত্যক্ষ। একটি ঘট প্রত্যক্ষকালে কেউ যদি বলে 'এটি ঘট' তাহলে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ঘটের জ্ঞান হবে শাব্দজ্ঞান, তা প্রত্যক্ষ হবে না। নব্য ন্যায়মতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ হল ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ হল ব্যাপার। ব্যাপারবান্ কারণকে করণ বলে। যা কারণের দ্বারা জন্য ও কারণের দ্বারা জন্য কার্যের জনক, তাই ব্যাপার। চক্ষু (করণ)→ঘট (বিষয়)→সন্নিকর্ষ (ব্যাপার)→ঘটের প্রত্যক্ষ।

কোন কোন নৈয়ায়িক ও বেদান্তী প্রত্যক্ষের এই লক্ষণের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করেছেন। তাঁরা বলেন, এই লক্ষণ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সমন্বয় হয় না। ঈশ্বর সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় না থাকায় ঐ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ জন্য বলা যাবে না।

এই অব্যাপ্তি দোষ পরিহারের জন্য নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ "প্রত্যক্ষস্য সাক্ষাৎকারিত্বং লক্ষণম্।"[১৭] অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ প্রতীতি বা সাক্ষাৎ জ্ঞান। বিশ্বনাথ বলেছেন ঃ "জ্ঞান অকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।"[১৮] অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হল সেই জ্ঞান যাতে অন্য জ্ঞান করণ হয় না। তাই প্রত্যক্ষজ্ঞান অকরণক জ্ঞান। অনুমিতিজ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, উপমিতিজ্ঞানে সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, শাব্দজ্ঞানে পদজ্ঞান করণ। কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানে অন্য জ্ঞান করণ হয় না।

নব্য নৈয়ায়িক মতে, প্রত্যক্ষের এই লক্ষণের দ্বারা জীবের প্রত্যক্ষ ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উভয়ই ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এই লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয় না।

কিন্তু 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং' এই পদের দ্বারা মহর্ষি গৌতম অনিত্য জীবপ্রত্যক্ষেরই লক্ষণ দিয়েছেন, ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষ উক্ত লক্ষণের লক্ষ্যই নয়—একথা বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে প্রথমে বলেছেন। সুতরাং গৌতমের লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা অমূলক।

লৌকিক সন্নিকর্ষ

ইন্দ্রিয়ের সামনে বিষয় উপস্থিত থাকলে তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যে সন্নিকর্ষ হয়, তাই লৌকিক সন্নিকর্ষ। ন্যায়মতে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের হেতু লৌকিক সন্নিকর্ষ ছপ্রকার। ন্যায়দর্শনে চক্ষুরাদি ভেদে ইন্দ্রিয় ছয়প্রকার বলে লৌকিক সন্নিকর্ষ ছপ্রকার বলা হয়নি। লৌকিক সন্নিকর্ষ ছপ্রকার, যেহেতু প্রত্যক্ষের বিষয় ছপ্রকার। ষড়বিধ সন্নিকর্ষবাদ প্রাচীন ন্যায় সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ মত। প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর এই মতের সমর্থক। ন্যায়মতে আমাদের ভাব বস্তুর ও অভাব বস্তুর লৌকিক প্রত্যক্ষ হতে পারে। এই লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় লৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা। ছটি লৌকিক সন্নিকর্ষ হল; (১) **সংযোগ**, (২) **সংযুক্ত সমবায়**, (৩) **সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়**, (৪) **সমবায়**, (৫) **সমবেত-সমবায়**, (৬) **বিশেষণ-বিশেষ্যভাব**। নীচে এই ছপ্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ ব্যাখ্যা করা হল ঃ

১. সংযোগ ঃ ন্যায়মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় অথবা ত্বক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। যখন একটি ঘটের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় বা একটি ঘটের ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়, তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় বা ত্বক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঐ ঘট দ্রব্যটির সংযোগ হয়। মনের দ্বারা আত্মদ্রব্যের প্রত্যক্ষে সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্রব্য, ঘটও দ্রব্য। মন দ্রব্য, আত্মাও দ্রব্য। দুটি দ্রব্যের সম্বন্ধ সংযোগই হয়। এভাবে দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সর্বত্র সংযোগই সন্নিকর্ষ হয়।

২. সংযুক্ত-সমবায় ঃ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের গুণ, কর্ম বা সামান্যের প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষের দ্বারা। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটরূপের যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এক্ষেত্রে চক্ষু সংযুক্ত ঘটে রূপ সমবেত হয়। এরূপ ঘ্রাণ ও রসনার দ্বারা গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষে সংযুক্ত-সমবায়ই সন্নিকর্ষ হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গতিশীল বলের প্রত্যক্ষে সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এক্ষেত্রে চক্ষু সংযুক্ত বলে গতি (motion) সমবেত (সমবায় সম্বন্ধে থাকে)। ন্যায় মতে, সামান্য বা জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে। ঘটত্ব, গোত্ব জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গোত্ব জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এক্ষেত্রে চক্ষুসংযুক্ত গো ব্যক্তিতে গোত্ব জাতি সমবেত হয়।

৩. সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় ঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বা কর্মে অবস্থিত সামান্য বা জাতির প্রত্যক্ষ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। যেমন, একটি লাল গোলাপের

লাল রঙে যে রক্তত্ব জাতি আছে তার প্রত্যক্ষে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এক্ষেত্রে চক্ষু সংযুক্ত গোলাপে রক্তবর্ণ সমবায় সম্বন্ধে থাকে বা সমবেত হয় এবং ঐ রক্তবর্ণে রক্তত্ব জাতি সমবেত হয়। এভাবেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা লাল গোলাপে বর্তমান রক্তত্ব জাতির প্রত্যক্ষ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষের দ্বারা হয়।

৪. **সমবায়** ঃ ন্যায়মতে, আকাশ নামক অতীন্দ্রিয় দ্রব্যের শব্দ নামক গুণের প্রত্যক্ষে সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। শব্দের প্রত্যক্ষ হয় শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা। ন্যায়মতে শ্রবণেন্দ্রিয় মানে আকাশ। কর্ণবিবরবর্তী আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়। আকাশ দ্রব্য, শব্দ গুণ। আকাশে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং আকাশ স্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শব্দের সমবায় সন্নিকর্ষ হয়।

৫. **সমবেত-সমবায়** ঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ গুণে অবস্থিত শব্দত্ব নামক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাতির প্রত্যক্ষে সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। শব্দত্ব হচ্ছে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ শব্দে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত জাতি। শব্দত্ব শব্দে সমবেত, যে শব্দ আবার কর্ণবিবরবর্তী আকাশে সমবেত।

৬. **বিশেষণ-বিশেষ্যভাব** ঃ ন্যায় মতে ভাবপদার্থের মত অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায় মতে অভাব একটি স্বতন্ত্র (অধিকরণ থেকে ভিন্ন) পদার্থ এবং অভাবের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হয়। অভাবের গ্রাহক ইন্দ্রিয়। অভাব প্রত্যক্ষে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ হয়। ন্যায় মতে, সাধারণত অভাব যে অধিকরণে থাকে তার বিশেষণ হয়। 'ভূতলটি ঘটাভাব বিশিষ্ট'। ('ঘটাভাববৎ ভূতলম্') এভাবে যখন ভূতলে ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তখন বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ হয়। উক্ত জ্ঞানে ভূতল (অধিকরণ) বিশেষ্য, ঘটাভাব ভূতলের বিশেষণ হয়। এক্ষেত্রে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ভূতলে (বিশেষ্য) ঘটাভাব বিশেষণ হয়। এভাবে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষের দ্বারা ভূতলে ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়।

বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষকে সংক্ষেপে 'বিশেষণতা' সন্নিকর্ষও বলা হয়। 'ভূতল ঘটাভাব বিশিষ্ট' ('ঘটাভাববৎ ভূতলম্') এভাবে অভাবের জ্ঞান হলে বিশেষণতা সন্নিকর্ষ হয়, যেহেতু এরূপ জ্ঞানে ঘটাভাব বিশেষণ হয়। 'ভূতলে ঘটাভাব' ('ভূতলে ঘটো নাস্তি') এভাবে অভাবের প্রত্যক্ষ হলে বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষ হয়, যেহেতু এরূপ জ্ঞানে ঘটাভাব বিশেষ্য হয়।

বিশেষণতা ও বিশেষ্যতা অতিরিক্ত সম্বন্ধ নয়। বিশেষণতা বিশেষণস্বরূপ। বিশেষ্যতা বিশেষ্যস্বরূপ। বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা স্বরূপ সম্বন্ধ। স্বরূপ সম্বন্ধ সম্বন্ধী থেকে ভিন্ন হয় না। ভূতল ও ঘটাভাবের সম্বন্ধ ভূতল ও ঘটাভাব হতে ভিন্ন নয় ;

তা ভূতল ও ঘটাভাব স্বরূপ। এটি স্বরূপ সম্বন্ধ। ঐ স্বরূপ সম্বন্ধই বিশেষণতা ও বিশেষ্যতা।[১৯]

অলৌকিক প্রত্যক্ষ

নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ

ন্যায়মতে প্রত্যক্ষজ্ঞান দুপ্রকার ঃ নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক। "প্রত্যক্ষং দ্বিবিধম্—নির্বিকল্পকং সবিকল্পকং চেতি।"[৩৬] বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা* গ্রন্থে মহর্ষি গৌতমের *ন্যায়সূত্র*-এ প্রত্যক্ষের লক্ষণে[৩৭] উল্লিখিত 'অব্যপদেশ্যম্' ও 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দ দুটিকে যথাক্রমে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক অর্থে গ্রহণ করেছেন। জয়ন্ত ভট্ট, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বিশ্বনাথ, অন্নংভট্ট প্রভৃতি পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা বাচস্পতির এই মত সমর্থন করেছেন।

---

৩৪. তর্কসংগ্রহ, অধ্যাপনাসহ, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ৩৬১-৬২;
ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃঃ ৩১১।

৩৫. The Nyāya Theory of Knowledge, S.C. Chatterjee, pp. 230-31.

৩৬. তর্কসংগ্রহ, অন্নংভট্ট।

৩৭. ১/১/৪।

ন্যায়মতে পরমাণু থেকে যাবতীয় অনিত্য যৌগিক বস্তু উৎপন্ন হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বা বিশিষ্ট জ্ঞানের পূর্বে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বা অবিশিষ্ট জ্ঞান স্বীকার করেন। বিষয়ের নির্বিকল্পক জ্ঞান হলেই সবিকল্পক জ্ঞান হয়। অন্নংভট্ট বলেছেন—"নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্" অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষে প্রকার বা বিশেষণ বিষয় হয় না, তাই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ।[৩৮] বিশ্বনাথ বলেছেন "বৈশিষ্ট্য অনবগাহী জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্" অর্থাৎ যে জ্ঞানে বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধ বিষয় হয় না, তাই নির্বিকল্পক জ্ঞান।[৩৯] নির্বিকল্পক শব্দের অন্তর্গত 'বিকল্প' শব্দের অর্থ বিশেষণ। 'নির্বিকল্পক' শব্দের অর্থ হচ্ছে যাতে কোন বিকল্প নাই; 'সবিকল্পক' শব্দের অর্থ হচ্ছে যাতে কোন বিকল্প আছে। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে কোন পদার্থ বিশেষণরূপে বিষয় হয় না, তা বস্তুর স্বরূপমাত্রের জ্ঞান। এরই নাম 'আলোচন'। 'বিকল্প' শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি নাম, জাতি, গুণ, বিশেষণ ও বিশেষ্যের সম্বন্ধ। বস্তুত কোন জ্ঞানকে নির্বিকল্পক বলার অর্থ হচ্ছে সেই জ্ঞানের বিষয় কোন নাম, জাতি, গুণ ইত্যাদি নয়।

অন্নংভট্ট নির্বিকল্পক জ্ঞানকে "নিষ্প্রকারক জ্ঞান" বলেছেন। 'নিষ্প্রকারক' শব্দের অর্থ 'বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ অনবগাহি জ্ঞান'। অর্থাৎ এই জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না।[৪০] অন্নংভট্ট সবিকল্পক জ্ঞানকে 'সপ্রকারক জ্ঞান' বলেছেন। 'সপ্রকারক' শব্দের অর্থ 'নাম জাত্যাদি বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ অবগাহি জ্ঞানম্'। অর্থাৎ 'যে জ্ঞানে নাম, জাতি প্রভৃতি বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্যের সম্বন্ধের জ্ঞান হয়, তাই সবিকল্পক জ্ঞান।'[৪১] বিশ্বনাথ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে 'অবিশিষ্টজ্ঞান' এবং সবিকল্পক জ্ঞানকে 'বিশিষ্টজ্ঞান' বলেছেন।[৪২]

ন্যায়মতে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে প্রথমেই সেই বিষয়ের 'আলোচন' অর্থাৎ নির্বিকল্পক জ্ঞান জন্মে। এই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পরক্ষণে সেই বিষয়ের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। যে প্রত্যক্ষে বিষয় শুধু 'একটা বস্তু' রূপেই প্রকাশিত হয়, কিরূপ বস্তু তা জানা যায় না, তাই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। নির্বিকল্পক জ্ঞানে যে বিষয় প্রতিভাত হয়, তাতে একটা বস্তু (something) ও তার বিশেষ ধর্মগুলি অসম্বদ্ধ (unrelated) অবস্থায় থাকে। ঘটের নির্বিকল্পক জ্ঞানে ঘটত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট ধর্মগুলি যে ঘটে থাকে না তা নয়, কিন্তু সেগুলি ঘটের বিশিষ্ট ধর্মরূপে

---

৩৮. তর্কসংগ্রহ।

৩৯. সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

প্রকাশিত হয় না। ঘটের সঙ্গে চক্ষুর সন্নিকর্ষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘট ও ঘটত্ব ধর্ম বিষয়ে অবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জন্মে। একে বলে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের পরক্ষণেই 'এটা ঘট' অর্থাৎ 'ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘটের' জ্ঞান, বিশিষ্টজ্ঞান, সবিকল্পক জ্ঞান হয়। ন্যায়মতে ঘটের সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ হলে ঘট, ঘটত্ব নিজ নিজ স্বরূপে ভাসমান হয়। ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ বা প্রকার—এরূপ জ্ঞান নির্বিকল্পক জ্ঞানের স্তরে হয় না। নির্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয়কে বিশেষ্য বা বিশেষণরূপে জানি না। এই প্রত্যক্ষের বিষয়ে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় না। তাই এই প্রত্যক্ষের বিষয় বিশেষ্যরূপেও জ্ঞাত হয় না। কেননা যা বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট, তাই বিশেষ্য। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় অবিশিষ্ট বস্তু, নিছক বস্তুস্বরূপ। সবিকল্পক জ্ঞানের স্তরে 'এটা ঘট' বা 'এটা ঘটত্ব বিশিষ্ট' এরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানে ঘট বিশেষ্যরূপে, ঘটত্ব বিশেষণরূপে বিষয় হয়।

"ন্যায়মতে 'সমবায়' নামক সম্বন্ধ এবং অভাব পদার্থের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। যে পদার্থের সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই সম্বন্ধী পদার্থ সেই প্রত্যক্ষে সমবায় অংশে বিশেষণরূপে বিষয় হবেই। যেমন, ঘটের অবয়বে ঘট সমবায়ের যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তা ঘটবিশিষ্ট সমবায়ের প্রত্যক্ষ। সুতরাং সমবায়ের নির্বিকল্পক জ্ঞান সম্ভবই হয় না। আবার ন্যায়মতে, কেবল অভাব বিষয়ক প্রত্যক্ষ হয় না, অভাবের প্রত্যক্ষে এই অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ অভাবাংশে বিশেষণরূপে বিষয় হবেই। সুতরাং সমবায় ও অভাব পদার্থের যে প্রত্যক্ষ তা সবিকল্পক বা বিশিষ্ট প্রত্যক্ষই। তাই নৈয়ায়িকেরা বলেন, সম্ভবস্থলে সর্বত্রই ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষের পর নির্বিকল্পক ও পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে।"[৪৩]

নৈয়ায়িকেরা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে অব্যপদেশ্য বলেছেন। নির্বিকল্পক জ্ঞান নিষ্প্রকারক জ্ঞান, বিশেষণ বর্জিত বস্তুর স্বরূপ মাত্রের জ্ঞান বলে এই জ্ঞান শব্দের দ্বারা অভিলাপ যোগ্য বা প্রকাশযোগ্য হয় না। বাল-মূকাদির জ্ঞানও শব্দের দ্বারা প্রকাশযোগ্য হয় না। তাই নৈয়ায়িকেরা নির্বিকল্পক জ্ঞানকে অবোধ বালক ও মূক ব্যক্তির জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সবিকল্পক জ্ঞান ব্যপদেশ্য জ্ঞান। এই জ্ঞান সপ্রকারক জ্ঞান বলে শব্দের দ্বারা প্রকাশযোগ্য। নির্বিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা কোন ব্যবহার সম্ভব হয় না। কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞান ব্যবহারের প্রতি কারণ হয়।

ন্যায়মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব অনুব্যবসায় বা মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ। 'এটা ঘট' এই ব্যবসায় জ্ঞানকে বিষয় করে 'আমি ঘটকে জানি' এরূপ যে

---

৪৩. ন্যায়দর্শন, বঙ্গানুবাদ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮।

জ্ঞান হয়, তা অনুব্যবসায়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে কোন কিছু প্রকাররূপে ভাসমান হয় না বলে এই প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় হয় না। তাই বলা হয়েছে—'জ্ঞানং যৎ নির্বিকল্পাখ্যং তৎ অতীন্দ্রিয়ম ইষ্যতে'; অর্থাৎ নির্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়।[৪৪]

বৌদ্ধ দার্শনিকেরা সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রমাণ। তাঁরা বলেন—প্রমাণের বিষয় দুপ্রকার ঃ বিশেষ বা স্বলক্ষণ এবং সামান্য বা সামান্যলক্ষণ। স্বলক্ষণই পরমার্থ সৎ। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে স্বলক্ষণ বিষয় হয়। তাই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রমাণ।[৪৫] বৌদ্ধমতে "কল্পনাপোঢ়ম-অভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্বিকল্পকম্"। যে প্রত্যক্ষে নাম, জাতি, প্রভৃতি কাল্পনিক পদার্থের যোজনা হয় না, যে প্রত্যক্ষ কেবল সেই বিষয়ের স্বলক্ষণ বা স্বরূপমাত্রের নিশ্চায়ক, যে জ্ঞান অভ্রান্ত, তাই নির্বিকল্পক। যেমন, ঘটের প্রত্যক্ষকালে সেই ঘটবিশেষেরই প্রত্যক্ষ হয়। তাতে ঘটত্ব প্রভৃতি বিষয় হয় না। এই প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়, যেহেতু এই প্রত্যক্ষে বস্তুতে জাতি, গুণ, ক্রিয়া, নাম এবং দ্রব্য কল্পিত হয়। এই পঞ্চবিধ কল্পনার দ্বারা ব্যক্তি-জাতি, দ্রব্য-গুণ, প্রভৃতির ভেদ কল্পনা করা হয়, যদিও বস্তুত তাদের ভেদ নাই। তাই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ অযথার্থ বা অপ্রমাণ।[৪৬]

আবার, শাব্দিক সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক, যেমন ভর্তৃহরি, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, সব প্রত্যক্ষই সবিকল্পক।

নৈয়ায়িকেরা এ দুটি মতের বিরোধিতা করে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্যই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। শাব্দিকেরা বলেন—'ননু নির্বিকল্পকে কিং প্রমাণম্' অর্থাৎ 'নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই'।

এর উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন—নির্বিকল্পক জ্ঞানের অনুব্যবসায় বা মানস প্রত্যক্ষ না হলেও এই প্রত্যক্ষ অবশ্যস্বীকার্য। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অস্তিত্বে অনুমানই প্রমাণ। অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

অন্নংভট্ট বলেছেন ঃ "গৌঃ ইতি বিশিষ্ট জ্ঞানং বিশেষণ জ্ঞানজন্যং বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ দণ্ডীতি জ্ঞানবৎ ইতি অনুমানস্য প্রমাণত্বাৎ"। অনুমানটি হল ঃ 'এটা গরু' এই বিশিষ্ট- জ্ঞানটি বিশেষণের জ্ঞান হতে উৎপন্ন, যেহেতু ঐ বিশিষ্টজ্ঞানটি 'দণ্ড যুক্ত একটা মানুষ' (দণ্ডী)—এই বিশিষ্টজ্ঞানের অনুরূপ।[৪৭]

---

৪৪. ভাষাপরিচ্ছেদ, বিশ্বনাথ, কারিকা, পৃঃ ৫৭।

৪৫. ন্যায়দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০১।

৪৬. A History of Indian Phil...

নৈয়ায়িকেরা বলেন—সবিকল্পক জ্ঞান নির্বিকল্পক জ্ঞান ছাড়া হতে পারে না, যেহেতু সবিকল্পক জ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞান এবং বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ ('বিশিষ্ট বুদ্ধৌ বিশেষণ জ্ঞানস্য কারণত্বাৎ')।[৪৮] পূর্বে বিশেষণের জ্ঞান না হলে বিশিষ্টজ্ঞান হয় না। দণ্ড বিশেষণের জ্ঞান না থাকলে যেমন কোন ব্যক্তিকে দণ্ডী বলা যায় না, তেমনি গোত্ব বিশেষণের জ্ঞান না থাকলে 'এটা গরু' বা 'গোত্ব বিশিষ্ট গো ব্যক্তি'র জ্ঞান হয় না। বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ হওয়ায় 'গোত্ব বিশেষণ বিশিষ্ট গো ব্যক্তি'র জ্ঞানের অর্থাৎ 'এটা গরু' এই বিশিষ্টজ্ঞানের পূর্বে গোত্বের জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। ন্যায়মতে, এই গোত্বের জ্ঞান সবিকল্পক বা বিশিষ্টজ্ঞান হতে পারে না। গোত্বের জ্ঞানও বিশিষ্টজ্ঞান হলে তার জ্ঞানের জন্য আর একটি বিশেষণের জ্ঞান (অর্থাৎ গোত্বত্ব-এর জ্ঞান) স্বীকার করতে হবে এবং ঐ জ্ঞানটিও বিশিষ্টজ্ঞান হলে আবার আর একটি বিশেষণের জ্ঞান স্বীকার করতে হবে। এভাবে অনবস্থা দোষ অনিবার্য। এই অনবস্থা পরিহারের জন্য নৈয়ায়িকেরা বলেন—'গোত্ববিশিষ্ট গোব্যক্তি'র সবিকল্পক জ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞানের পূর্বে ঐ জ্ঞানের কারণরূপে গোত্বের জ্ঞান স্বীকার্য। এই জ্ঞান নির্বিকল্পক। ('বিশেষণ জ্ঞানস্যাপি সবিকল্পকত্বে অনবস্থা প্রসঙ্গাৎ নির্বিকল্পক সিদ্ধিঃ')।[৪৯]

৭.১৬. অনুমান (Inference)

'অনুমান' কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'পশ্চাৎ-জ্ঞান', অর্থাৎ যে জ্ঞান অপর কোন জ্ঞানের পর হয় ('অনু' অর্থে পশ্চাৎ, 'মান' অর্থে জ্ঞান)। 'অনুমান' বলতে আমরা সাধারণত যথার্থ জ্ঞানকে বুঝি। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে 'অনুমান' শব্দটিকে 'প্রমা' বা 'যথার্থ জ্ঞান' অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি। ভারতীয় দর্শনে 'অনুমান' বলতে বোঝায় 'প্রমাণ' অর্থাৎ যথার্থ **জ্ঞান লাভের পদ্ধতি**। এই পদ্ধতির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানকে বলা হয় '**অনুমিতি**'। অনুমিতি প্রত্যক্ষ অনুভব নয়, পরোক্ষ অনুভব।

অনুমান একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে জ্ঞাত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। কোন এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই—এমন এক বিষয়ের জ্ঞানলাভের প্রণালী হল অনুমান। দূর থেকে রান্নঘরে ধূম দেখে আমরা বলি যে, রান্নাঘরে বহ্নি আছে। এখানে বহ্নি প্রত্যক্ষ করা হয়নি, অনুমান করা হয়েছে।

এই অনুমান দুটি পূর্বজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। যথা-- (১) রান্নাঘরে ধূমের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষজ্ঞান ও (২) 'যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি'—এমন পূর্বার্জিত জ্ঞান। এ-দুটি পূর্বজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই রান্নাঘরে বহ্নির অনুমান করা সম্ভব। প্রথম পূর্বশর্তটিকে বলে **লিঙ্গদর্শন** (রান্নাঘরে ধূম দর্শন। ধূম হল 'লিঙ্গ' বা 'হেতু')। দ্বিতীয় পূর্বশর্তটিকে বলে **লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ জ্ঞান** (ধূম = লিঙ্গ, বহ্নি = লিঙ্গী। ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধজ্ঞান বা **ব্যাপ্তিজ্ঞান**)। এ-দুটি পূর্বশর্তের

ওপর নির্ভর করেই অপ্রত্যক্ষগোচর লিঙ্গীর (বহ্নির) জ্ঞান বা অনুমান হতে পারে। এই দুটি পূর্বশর্তের সংযুক্তিকে বলে 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞান' বা 'পরামর্শ'। এই পরামর্শ-এর পরেই অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। **'পরামর্শ জন্যং জ্ঞানং অনুমিতি'**। পরামর্শ থেকে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাই অনুমিতি।

প্রতিটি অনুমানের তিনটি ধর্মবিশিষ্ট তিনটি পদ (Term) ও অন্তত তিনটি বচন (Proposition) থাকে। তিনটি ধর্ম যথাক্রমে (১) **পক্ষ ধর্ম** (Minor term), (২) **সাধ্য ধর্ম বা লিঙ্গী** (Major term) এবং (৩) **হেতু ধর্ম বা লিঙ্গ** (Middle term)। পাকশালায় (রান্নাঘরে) ধূম দেখে আমরা যখন অনুমান করি যে, সেখানে বহ্নি আছে, তখন সেই অনুমানের আকারটি হয় নিম্নরূপ ঃ

ঐ পাকশালায় বহ্নি আছে,
কেননা, ঐ পাকশালায় ধূম আছে, এবং
যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি।

৮.১৭. পক্ষ, সাধ্য ও হেতুর প্রত্যয় বা ধারণা (Concept of Paksha, Sadhya and Hetu)

প্রত্যেক অনুমানে তিনটি ধর্ম বিশিষ্ট পদ (Term) এবং অন্তত তিনটি বচন (Proposition) থাকে। তিনটি ধর্ম হচ্ছে— (১) পক্ষ ধর্ম, (২) সাধ্য ধর্ম বা লিঙ্গী ও (৩) হেতুধর্ম বা লিঙ্গ। পাকশালায় ধূম দেখে আমরা যখন অনুমান করি যে সেখানে বহ্নি আছে তখন সেই অনুমানের আকারটি (ত্রি-অবয়বী) হয়—

যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যথা—যজ্ঞশালা, গোশালা, ইত্যাদি
পাকশালায় ধূম আচ্ছে
∴ পাকশালায় বহ্নি আছে।

এখানে 'পাকশালা' হচ্ছে পক্ষ ধর্মবিশিষ্ট পদ, 'বহ্নি' সাধ্য ধর্মবিশিষ্ট পদ এবং 'ধূম' হেতু ধর্মবিশিষ্ট পদ। তিনটি ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা গেল ঃ

(১) **পক্ষ ঃ যেখানে সাধ্যের সংশয় থাকে তাকে 'পক্ষ' বলে।** পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধ স্থাপনই অনুমানের লক্ষ্য। যে পদার্থে সাধ্যের অনুমান করা হয়, তাই পক্ষ। ধূম দর্শন করে পর্বতে বহ্নি অনুমান করার ক্ষেত্রে 'বহ্নি' হচ্ছে সাধ্য আর পর্বত হচ্ছে 'পক্ষ'। অনুমিত বচনের (অনুমিতির) উদ্দেশ্য হচ্ছে পক্ষ আর বিধেয় সাধ্য। পক্ষ হল ধর্মী, আর সাধ্য সেই ধর্মীয় ধর্ম।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ পক্ষের লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন, 'সন্দিগ্ধ সাধ্যবান পক্ষ', অর্থাৎ যে পদার্থে সাধ্যের সংশয় থাকে সেই পদার্থ **পক্ষ**। যে পদার্থে সাধ্যধর্ম পূর্বেই নিশ্চিত অর্থাৎ সর্বসম্মত, তাকে বলে 'সপক্ষ'। যেমন, পর্বতে ধূম দেখে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা সকলেই নিশ্চিত জানি যে পাকশালায় (ধূমের সঙ্গে) বহ্নি থাকে। এখানে 'পাকশালা' সপক্ষ। এজন্যই ন্যায়দর্শনে 'সপক্ষকে' বলা হয়েছে 'নিশ্চিত সাধ্যবান'। তেমনি, যে পদার্থে সাধ্যধর্মের অভাব পূর্বেই নিশ্চিত অর্থাৎ সর্বসম্মত, তাকে বলে **'বিপক্ষ'**। যেমন, পর্বতে ধূম দেখে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা সকলেই নিশ্চিত জানি যে মহাহ্রদে বহ্নির অভাব আছে অর্থাৎ বহ্নি নেই (ধূমও নেই)। এখানে 'মহাহ্রদ' হচ্ছে বিপক্ষ। এজন্য ন্যায়দর্শনে 'বিপক্ষকে' বলা হয়েছে 'নিশ্চিত সাধ্যাভাববান'। কিন্তু

পর্বতে ধূম দেখে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে বহ্নির অধিকরণ যে সপক্ষ 'পর্বত' তা 'পাকশালা' ইত্যাদি বিপক্ষ 'মহাহ্রদের' মতো নয়, কেননা এক্ষেত্রে পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় আছে। কাজেই সাধ্যের (বহ্নির) অধিকরণটি (পর্বত) 'সন্দিগ্ধ সাধ্যবান' অর্থাৎ অধিকরণটিতে সাধ্যধর্ম (বহ্নি) সন্দিগ্ধ। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এই প্রকার সন্দিগ্ধ সাধ্যবান পদার্থকেই 'পক্ষ' বলেছেন। পক্ষে সাধ্য প্রত্যক্ষ হলে, পক্ষতে সাধ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় না থাকলে, সেই পক্ষতে সাধ্যের উপস্থিতি সম্পর্কে সাধারণত অনুমানের প্রয়োজন হয় না। কাজেই, প্রাচীন মতে, যে পদার্থে সাধ্যে সংশয় থাকে কেবল সেই পদার্থ হচ্ছে 'পক্ষ'।

নব্য নৈয়ায়িক প্রাচীন মত মানেন না। নব্যেরা বলেন যে, সাধ্যসিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (বহ্নির) সিদ্ধি বা নিশ্চিত জ্ঞান থাকলেও, যদি 'সিষাধয়িষা' বা 'অনুমান করার ইচ্ছা' থাকে তাহলেও পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (বহ্নির) অনুমান সম্ভব হতে পারে। এখানে সিদ্ধি হচ্ছে অনুমানের প্রতিবন্ধক আর 'সিষাধয়িষা' অনুমানের উত্তেজক। প্রতিবন্ধক (সিদ্ধি) থাক অথবা না থাক, যদি উত্তেজক (সিষাধয়িষা) থাকে তাহলেও অনুমান সম্ভব হবে। কাজেই, নব্যমতে, যদি কোন অধিকরণে সাধ্যের সংশয় (সিদ্ধির অভাব) থাকে অথবা অনুমানের ইচ্ছা (সিষাধয়িষা) থাকে, অথবা দুটি বৈশিষ্ট্যই থাকে, তাহলে সেই অধিকরণ বা পদার্থকে 'পক্ষ' বলা হবে। নিম্নোক্তভাবে বিষয়টি বোঝান গেল—

(ক) সিদ্ধি আছে এবং সিষাধয়িষা আছে—অনুমান সম্ভব

(খ) সিদ্ধি আছে কিন্তু সিষাধয়িষা নেই---অনুমান সম্ভব নয়।

(গ) সিদ্ধি নেই কিন্তু সিষাধায়িষা আছে—অনুমান সম্ভব

(ঘ) সিদ্ধি নেই এবং সিষাধয়িষা নেই—অনুমান সম্ভব।

কেবল দ্বিতীয় ক্ষেত্রের (খ) অনুমিতির উদ্দেশ্যটিকে 'পক্ষ' বলা যাবে না, কেননা সেক্ষেত্রে সাধ্যের সংশয় নেই (অর্থাৎ সিদ্ধি আছে), আবার অনুমানের ইচ্ছাও নেই (সিষাধয়িষা নেই)। বাকি তিনটি ক্ষেত্রেই (ক, গ, ও ঘ) অনুমিতির উদ্দেশ্যকে 'পক্ষ' বলা যাবে। ভারতীয় ন্যায়ে যাকে পক্ষ বলা হয়, অ্যারিস্টলের ন্যায়ে তাকে Minor Term বলা হয়।

(২) **সাধ্য ধর্ম ঃ**

অনুমানের সাহায্যে যা প্রমাণিত হয় তাকেই 'সাধ্য' বলে। ভিন্নভাবে বলা যায়—পক্ষে যা সাধন করা হয় বা প্রমাণ করা হয় তাকেই 'সাধ্য' বলে। সাধ্যকে 'অনুমেয়'ও বলা হয়, কেননা সাধ্যই হচ্ছে অনুমানের বিষয়। ধূম দেখে পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে অনুমানের বিষয় (অনুমেয়) হচ্ছে 'বহ্নি'—পক্ষ পর্বতে বহ্নির অনুমান করা হয়। কাজেই এখানে 'বহ্নি' হচ্ছে সাধ্য। অনুমিতিরূপ সিদ্ধান্ত বাক্যের বিধেয়টি সাধারণত সাধ্য-ধর্ম জ্ঞাপক হয়। 'সাধ্য' হচ্ছে 'পক্ষে'র (যা সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য) ধর্ম। পক্ষ হল ধর্মী, 'সাধ্য' তার ধর্ম। পর্বত বহ্নিমান,—এই অনুমিতির ক্ষেত্রে পর্বত হচ্ছে ধর্মী, বহ্নিত্ব যার ধর্ম। কাজেই, অনুমিতির বিধেয় 'বহ্নি' হচ্ছে সাধ্যধর্ম। ভারতীয় ন্যায়ে যাকে 'সাধ্য' বলা হয়, অ্যারিস্টলের ন্যায়ে তাকে Major Term বলা হয়।

(৩) **হেতু ধর্ম ঃ**

হেতু বা লিঙ্গের মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে পক্ষধর্ম ও সাধ্যধর্মের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়। হেতু হল অনুমানের ভিত্তি। 'পর্বতঃ বহ্নিমান, ধূমাৎ'—এই অনুমানে পর্বতে ধূম দেখে বহ্নি অনুমান

করা হয়েছে। এখানে পর্বতে ধূমের প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকলেও পর্বতে বহ্নির প্রত্যক্ষজ্ঞান নেই। পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করে সেখানে বহ্নি অনুমান করা হয়েছে। এখানে 'ধূম' হচ্ছে হেতু। হেতুকে 'লিঙ্গও' বলা হয়। 'লিঙ্গ' অর্থে 'চিহ্ন'। হেতু-চিহ্ন দেখেই পক্ষে, সাধ্যের অনুমান করা হয়। হেতুকে আবার 'ব্যাপ্য'ও বলা হয় (সাধ্যকে বলা হয় 'ব্যাপক'); কেননা হেতুধর্ম সর্বদা সাধ্যধর্ম দ্বারা ব্যাপ্ত হয় (ঢাকা পড়ে)—হেতুর পরিধি বা ব্যাপকতা সাধারণত সাধ্যের পরিধি অপেক্ষা কম হয়। হেতু না থাকলে অনুমান সম্ভব হয় না। হেতুর সঙ্গে পক্ষের এবং হেতুর সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধজ্ঞান না থাকলে অনুমান হয় না। উক্ত উদাহরণে হেতু 'ধূমের' সঙ্গে পক্ষ 'পর্বত' ও সাধ্য 'বহ্নি'র সম্বন্ধ আছে। এভাবে, হেতুর মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমানের হেতুটিকে পূর্বজ্ঞাত (প্রসিদ্ধ) পদার্থ হতে হয়।

অ্যারিস্টটলের ন্যায়ে হেতুধর্মবিশিষ্ট পদকে বলা হয় 'Middle term'। ন্যায় দর্শনে সৎ হেতুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—(ক) পক্ষসত্ত্ব, (খ) সপক্ষাসত্ত্ব, (গ) বিপক্ষাসত্ত্ব, (ঘ) অবাধিতত্ত্ব ও (ঙ) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব।

(ক) **পক্ষসত্ত্ব ঃ হেতুধর্মের, পক্ষধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াকে বলে 'পক্ষসত্ত্ব'**। একটি ত্রি-অবয়বী ন্যায়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝান গেল—

পর্বত বহ্নিমান

যেহেতু পর্বত ধূমবান

যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যথা—পাকশালা, যজ্ঞশালা গোশালা প্রভৃতি।

এখানে 'ধূম' হচ্ছে হেতু এবং 'পর্বত' পক্ষ। এখানে (দ্বিতীয় বচনে) পর্বতের সঙ্গে ধূমের সম্পর্ক দেখান হয়েছে; কাজেই ধূমে পক্ষসত্ত্ব আছে

(খ) **সপক্ষাসত্ত্ব ঃ যে যে পদার্থে সাধ্য (যথা—বহ্নি) উপস্থিত থাকে সেই সেই পদার্থে হেতুর (যথা—ধূমের) নিশ্চিত উপস্থিতি হচ্ছে সপক্ষাসত্ত্ব, অর্থাৎ সপক্ষে হেতুর উপস্থিত থাকা হচ্ছে সপক্ষাসত্ত্ব**। ধূম দেখে পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে পাকশালা, যজ্ঞশালা, গোশালা প্রভৃতি হচ্ছে সপক্ষ, কেননা আমরা নিশ্চিত জানি যে ঐ সব স্থানে বহ্নি থাকে (ধূমও থাকে)। কাজেই পাকশালা প্রভৃতি পক্ষে হেতু ধূমের সপক্ষসত্ত্ব আছে।

(গ) **বিপক্ষাসত্ত্ব ঃ বিপক্ষে হেতুর না থাকা হচ্ছে বিপক্ষাসত্ত্ব**। অনুমানের সাধ্যটি যে-সব স্থানে নেই বলে আমাদের নিশ্চিতজ্ঞান থাকে সেইসব স্থান বা অধিকরণ হচ্ছে বিপক্ষ। ধূম দেখে পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত জানি যে সমুদ্রে, হ্রদে, নদীতে বহ্নি থাকে না (ধূমও থাকে না)। কাজেই সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ে (বিপক্ষে) হেতু ধূমের বিপক্ষাসত্ত্ব আছে।

(ঘ) **অবাধিতত্ত্ব ঃ** অনুমান ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা হেতুর খণ্ডিত হওয়া হচ্ছে 'বাধিত হওয়া'। আর অন্য **কোন বলশালী প্রমাণের দ্বারা, হেতুর খণ্ডিত না হওয়া হচ্ছে 'অবাধিত হওয়া' বা 'অবাধিতত্ত্ব'**। 'দ্রব্যত্ব' হেতু দর্শন করে বহ্নিতে 'শীতলতা' অনুমিত হলে (যথা-যেখানে দ্রব্যত্ব সেখানেই শীতলতা, বহ্নিতে দ্রব্যত্ব আছে। অতএব বাহ্নিতে শীতলতা আছে।) তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয়—আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বহ্নি শীতল নয়, উষ্ণ। এজন্য এখানে 'দ্রব্যত্ব' হেতুটি বাধিত, অর্থাৎ 'বহ্নিতে' হেতু 'দ্রব্য' বাধিত। কিন্তু ধূমকে হেতু ধরে পর্বতে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে ধূম অবাধিত হেতু, কেননা যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি। সৎ হেতুর

অবাধিতত্ত্ব থাকা প্রয়োজন।

(ঙ) **অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ঃ** কোন প্রতিপক্ষ না থাকাই হচ্ছে 'অসৎ-প্রতিপক্ষ হওয়া'। যে হেতুর কোন প্রতিপক্ষ থাকে না, তাকে বলে 'অসৎপ্রতিপক্ষ হেতু'। একই বিষয় সম্বন্ধে যদি দুটি পরস্পর বিরোধী হেতুকে অবলম্বন করে বাদী ও প্রতিবাদী দুটি ভিন্ন সিদ্ধান্ত উপনীত হয়, তাহলে কোন একপক্ষ সিদ্ধান্তকে সুনিশ্চিত বলা যায় না। কাজেই, হেতুর প্রতিপক্ষ সৎ (থাকা) হলে সেই হেতুকে 'সৎ হেতু' বলা যাবে না। হেতুর প্রতিপক্ষ অসৎ হতে হবে, অর্থাৎ হেতুকে 'অসৎপ্রতিপক্ষ' হতে হবে। ধূম দেখে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু ধূমের কোন প্রতিপক্ষহেতু না থাকায় ঐ হেতুর অসৎপ্রতিপক্ষত্ব আছে, অর্থাৎ হেতুটি সৎ হেতু।

কোন অনুমানের হেতুর এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলে তবেই তাকে 'সৎ হেতু' বলা যাবে। হেতু সৎ না হলে অনুমান বৈধ হবে না এবং হেত্বাভাষ (fallacy) দেখা দেবে।

৮.১৮. অনুমানের ভিত্তি (Grounds of Inference)

অনুমান দুটি প্রধান শর্তের ওপর নির্ভর করে। এ-দুটি শর্তকে 'অনুমানের ভিত্তি' বলা হয়। শর্ত দুটি হল ঃ

(১) **পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পক্ষে হেতু দর্শন ঃ** পক্ষে হেতুর অবস্থানকে **'পক্ষধর্মতা'** বলে। পক্ষটি যে হেতুবান—এমন জ্ঞানকে **'পক্ষধর্মতাজ্ঞান'** বলে। পক্ষধর্মতাজ্ঞান অনুমানের একটি পূর্বশর্ত। 'পর্বতটি ধূমবান; অতএব পর্বতটি বহ্নিমান।'—এই অনুমানে প্রথম বচনটি হচ্ছে পক্ষে (পর্বতে) হেতু (ধূম) দর্শন বা পক্ষধর্মতাজ্ঞান।

(২) **ব্যাপ্তিজ্ঞান ঃ 'ব্যাপ্তি' হচ্ছে হেতু ও সাধ্যের নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধজ্ঞান।** পর্বতটি ধূমবান, যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি; অতএব পর্বতটি বহ্নিমান'—এই অনুমানে ধূম (হেতু) ও বহ্নির (সাধ্যের) সম্বন্ধজ্ঞানই— যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি-এমন জ্ঞানই—ব্যাপ্তিজ্ঞান।

'পর্বতটি ধূমবান' এমন পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং 'যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি'—এমন ব্যাপ্তিজ্ঞান হলে তবেই 'পর্বতটি বহ্নিমান'—এমন অনুমিতি সম্ভব।

(৩) **পরামর্শ ঃ** নৈয়ায়িকগণ অনুমানের আরও একটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে হলে অনুমান করা যায় না। পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান উভয়কে একসঙ্গে যুক্ত করে তবেই অনুমান সম্ভব হয়। এই তৃতীয় শর্তটি হল, **ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান। একে 'পরামর্শও'** বলা হয়। নব্যন্যায় মতে, পরামর্শের জন্য যে জ্ঞান তাই অনুমিতি। **'পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি'।** 'পর্বতে বহ্নিব্যাপ্তিবিশিষ্টধূম আছে'—এমন জ্ঞান হল পরামর্শ বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান।

৮.১৯. পরামর্শ (Parāmarsa) বা লিঙ্গ-পরামর্শ (Linga-parāmarsa)

ন্যায় দর্শনে 'অনুমান' বলতে 'পঞ্চাবয়বী ন্যায়'-কেই বোঝান হয়। ন্যায়মতে 'পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি,' অর্থাৎ পরামর্শের জন্য যে জ্ঞান তাই অনুমিতি*। **'পরামর্শ' বলতে বোঝায় 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান'।** ত্রি-অবয়বী ন্যায়ে পক্ষধর্মতাজ্ঞান থাকে, ব্যাপ্তিজ্ঞানও থাকে, কিন্তু 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান' অর্থাৎ 'পরামর্শ' থাকে না, থাকলেও তাকে বচনে প্রকাশ করা

* অনুমান পদ্ধতির (প্রমাণের) মাধ্যমে লব্ধজ্ঞান 'অনুমিতি'।

হয় না। 'পক্ষধর্মতাজ্ঞান' হল পক্ষে হেতু দর্শন। 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' হল সাধ্য ও হেতুর নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধের জ্ঞান। 'ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান' হচ্ছে এ-দুটি জ্ঞানের সংযুক্তি অর্থাৎ পক্ষে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর বর্তমানতা সম্পর্কে জ্ঞান। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝান গেল ঃ

ত্রি-অবয়বী ন্যায়—

যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি (ব্যাপ্তিজ্ঞান)

পর্বতটি ধূমবান (পক্ষধর্মতাজ্ঞান)

অতএব, পর্বতটি বহ্নিমান।

এই ত্রি-অবয়বী ন্যায়ে প্রথম আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু এ-দুটি আশ্রয়বাক্যের কোন একটি থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হতে পারে না। এ-দুটি আশ্রয়বাক্যকে যুক্ত করে তৃতীয় এক আশ্রয়বাক্য গঠন করলে তবেই সেই আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিষ্কাশিত হতে পারে। ত্রি-অবয়বী ন্যায়ে মনে মনে এই সংযুক্তিকরণ হলেও তাকে বচনে প্রকাশ করা হয় না। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে দুটি আশ্রয়বাক্যকে মনে মনে সংযুক্ত করে তাকে ভিন্ন এক বচনের আকারে প্রকাশ করা হয় এবং সেই বচনটিকেই বলা হয় 'পরামর্শ' বা 'লিঙ্গপরামর্শ'। লিঙ্গপরামর্শটি সিদ্ধান্তের ঠিক পূর্বে থাকে বলে তাকেই সিদ্ধান্তের করণরূপে গণ্য করা হয়। যেমন—

পঞ্চাবয়বী ন্যায়—

১। পর্বতটি বহ্নিমান

২। যেহেতু পর্বতটি ধূমবান (পক্ষধর্মতাজ্ঞান)

৩। যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি (ব্যাপ্তিজ্ঞান), যথা—পাকশালা

৪। বহ্নিব্যাপ্য ধূম ঐ পর্বতে আছে (ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শ)

৫। অতএব, পর্বতটি বহ্নিমান।

এখানে চতুর্থ বচনটি হচ্ছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বচনের সংযুক্তিকরণ। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, চতুর্থ বচনটিতে অনুমানের পক্ষ, সাধ্য ও হেতু এই তিনটি ধর্মই উপস্থিত আছে। ত্রি-অবয়বী ন্যায়ে কোন আশ্রয়বাক্যেই তিনটি ধর্ম একত্রে থাকে না। এর ফলে ত্রি-অবয়বী ন্যায়ের সিদ্ধান্তে পক্ষধর্ম ও সাধ্যধর্মের মধ্যে সম্বন্ধ পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের চতুর্থ আশ্রয়বাক্যে তিনটি ধর্ম একত্রে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা প্রত্যক্ষভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই চতুর্থ বচনটি হচ্ছে 'পরামর্শ' বা 'লিঙ্গপরামর্শ'। এই বাক্যটি শুনে শ্রোতার মনে 'পরামর্শ' উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সে স্মরণ করে—পর্বতে যে ধূম দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে বহ্নির ব্যাপ্তিযোগ আছে। এই প্রকার স্মরণের ফলে পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (বহ্নির) উপস্থিতি সম্পর্কে শ্রোতার মনে কোন সংশয় থাকে না এবং সে উপলব্ধি করে (সিদ্ধান্ত করে) যে, 'পর্বতে বহ্নি আছে'। এজন্যই নৈয়ায়িক বলেছেন—'পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি'—অর্থাৎ পরামর্শ অনুমিতির করণ—পরামর্শ না হলে অনুমিতি হয় না।

৮.২০. সহচর নিয়মরূপে ব্যাপ্তি (Vyapti as Sahachara Niyama)

ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির অপরিহার্য শর্ত। ব্যাপ্তিজ্ঞান না হলে অনুমিতি হয় না। হেতু ও সাধ্যের

মধ্যে (ভাষান্তরে, লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে) নিয়ত সাহচর্য বা সহচর-সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি। সংক্ষেপে ব্যাপ্তি হল— 'হেতু ও সাধ্যের মধ্যে সহচর নিয়ম'। কথাটির অর্থ বুঝতে হলে 'সহচর' ও 'নিয়ম' শব্দ দুটির অর্থ জানা প্রয়োজন।

'নিয়ম' বলতে বোঝায়, যা নিয়ত বা ব্যতিক্রমহীন। যার ব্যতিক্রম নেই তাই নিয়ম। তাহলে 'সহচর নিয়ম' কথার মানে হল—'ব্যতিক্রমহীন সহচর বা সাহচর্য'। দুটি বিষয়ের সাহচর্য যদি ব্যতিক্রমহীন হয় তবে তারা 'সহচর নিয়মে' আবদ্ধ বুঝতে হবে। ক ও খ-এর সম্পর্ক যদি এমন হয় যে, ক থাকলে খ-ও থাকে, আর খ না থাকলে ক-ও থাকে না, তাহলে তারা 'সহচর নিয়মে' আবদ্ধ হয়।

'সহচর' বলতে **সমানাধিকরণ** বা একাধিকরণ বোঝায়। দুটি বিষয় একই অধিকরণে থাকলে তাদের মধ্যে সহচর সম্বন্ধ আছে বুঝতে হবে। ধূম ও বহ্নির মধ্যে সহচর সম্বন্ধ, কেননা—যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি; আবার যেখানে বহ্নির অভাব সেখানে ধূমেরও অভাব। ধূম ও বহ্নির অধিকরণ একই। গাকশালায়, গোশালায়, চত্বরে, যজ্ঞবেদীতে দেখা যায় ধূম থাকলে বহ্নি থাকে, বহ্নি না থাকলে ধূমও থাকে না।

এ-প্রকার, হেতুর সঙ্গে সাধ্যের সহচর-সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি সম্বন্ধ। পর্বতে ধূম দর্শন করে সেখানে বহ্নি অনুমানের ক্ষেত্রে ধূম হচ্ছে 'হেতু' আর বহ্নি হচ্ছে 'সাধ্য'। ধূম ও বহ্নির মধ্যে সহচরসম্বন্ধ আছে—ধূম ও বহ্নি একই অধিকরণে থাকে। ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে সাহচর্য তা নিয়তও, কেননা যখন এবং যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি থাকে।

৮.২১. ব্যাপ্তির প্রকৃতি (Nature of Vyāpti)

দুটি পদার্থের মধ্যে নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি। অনুমানের ক্ষেত্রে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নিয়ত সাহচর্য হল ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ। **ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির প্রধান এবং অসাধারণ কারণ।** 'অসাধারণ' অর্থে যা সকল কার্যের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে না। মৃত্তিকা মৃন্ময় ঘটের অসাধারণ কারণ, কেননা মৃত্তিকা কেবল মৃন্ময় ঘট সৃজনের ক্ষেত্রেই থাকে, পট (বস্ত্র) বা কাঠের টেবিল সৃজনের ক্ষেত্রে থাকে না। ব্যাপ্তিজ্ঞান কেবল অনুমিতির ক্ষেত্রেই থাকে, প্রত্যক্ষজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে থাকে না। এজন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির 'অসাধারণ' কারণ।

ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ হচ্ছে 'ব্যাপ্য-ব্যাপক-সম্বন্ধ'। কথাটির অর্থ জানার জন্য 'ব্যাপক' ও 'ব্যাপ্য' শব্দ দুটির মানে জানা প্রয়োজন। যার দ্বারা ব্যাপ্ত হয় (যা ঢাকা দেয়) তাকে 'ব্যাপক' এবং যা ব্যাপ্ত হয় (ঢাকা পড়ে) তাকে 'ব্যাপ্য' বলে। ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ অনৌপাধিক (unconditional), অব্যভিচারী (invariable), আবশ্যিক (necessary) ও নিয়ত সহচর (universal)। এ-সম্বন্ধ শর্তাধীন নয়, উপাধি-নির্ভর নয় এবং এই সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম নেই।

ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ, কেননা যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি এবং এর কোন বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত নেই। এখানে ধূম 'হেতু' আর বহ্নি 'সাধ্য'; ধূম 'ব্যাপ্য' আর বহ্নি 'ব্যাপক'। বহ্নি ধূমের ব্যাপক আর ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। **সাধারণত যা ব্যাপক তার পরিধি যা ব্যাপ্য তার পরিধি অপেক্ষা বেশি।** বহ্নির পরিধি বা ব্যাপকতা ধূমের পরিধি বা ব্যাপকতা অপেক্ষা বেশি। যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি। কিন্তু এমন বললে ঠিক হবে না, 'যেখানে বহ্নি সেখানেই ধূম'। বহ্নি ধূমকে নিয়ত অনুগমন করলেও ধূম বহ্নিকে নিয়ত অনুগমন করে না। ধূম বহ্নি অপেক্ষা

অল্পস্থান থাকে, তাই ধূম 'ব্যাপ্য' ; বহ্নি ধূম অপেক্ষা অধিক স্থানে থাকে, তাই বহ্নি 'ব্যাপক'। ধূম থাকলেই বহ্নি থাকে, কিন্তু বহ্নি থাকলে সেখানে ধূম না থাকতেও পারে। তপ্ত লৌহপিণ্ডে বহ্নি থাকলেও ধূম থাকে না। সুতরাং বহ্নি ধূমের দ্বারা ব্যাপ্ত নয়। ধূম ও বহ্নির ক্ষেত্রে তাই ধূম 'ব্যাপ্য', বহ্নি 'ব্যাপক'। এ-কারণে ধূমকে 'হেতু' করে ও বহ্নিকে 'সাধ্য'রূপে গণ্য করে অনুমান করা চলে, কেননা **ধূম ও বহ্নির মধ্যে নিয়ত সহচরসম্বন্ধ আছে**। কিন্তু বহ্নিকে 'হেতু' ও ধূমকে 'সাধ্য'রূপে গণ্য করে অনুমান করলে তা বৈধ হবে না, কেননা বহ্নি ও ধূমের মধ্যে নিয়ত সাহচর্য নেই। ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ ব্যাপ্তি সম্বন্ধ, কেননা এ সম্বন্ধ অনৌপাধিক অর্থাৎ শর্তহীন; কিন্তু বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ অনৌপাধিক বা শর্তহীন নয়, এ সম্বন্ধ উপাধিযুক্ত বা শর্তাধীন। ভিজে কাঠযুক্ত বহ্নির সঙ্গেই ধূম থাকে। এখানে 'ভিজে কাঠ' হল উপাধি। সঠিক অর্থে বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধকে 'ব্যাপ্তি' বলা যাবে না।

৮.২২. ব্যাপ্তির প্রকার (Kinds of Vyapti)

ব্যাপ্তি দুপ্রকার—(১) **সমব্যাপ্তি** ও (২) **বিষমব্যাপ্তি বা অসমব্যাপ্তি**। সমব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের ব্যাপকতা সমান হয়, অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয়ে সমব্যাপক হয়। ক ও খ দুটি বিষয় তখনই সমব্যাপক হবে যদি এমন হয় যে, যেখানে ক সেখানেই খ এবং যেখানে খ সেখানেই ক। এমন হলে, ক ও খ-এর মধ্যে সমব্যাপ্তি আছে বলতে হবে। সমব্যাপ্তির উদাহরণ হল—'সকল উৎপত্তিশীল বস্তু হয় বিনাশশীল'। এখানে 'উৎপত্তিশীল বস্তু' ও 'বিনাশশীল বস্তু' সমব্যাপক, কেননা—যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ আছে, আবার যার বিনাশ আছে তার উৎপত্তি আছে। কাজেই, এক্ষেত্রে যে কোন একটি থেকে অপরটিকে বৈধভাবে অনুমান করা যায়।

বিষমব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের ব্যাপকতা ভিন্ন হয়। অর্থাৎ, সমব্যাপক নয় এমন দুটি বিষয়ের ব্যাপ্তিকে বিষয়ব্যাপ্তি বলে। বহ্নি ও ধূমের ব্যাপ্তি বিষমব্যাপ্তি। ধূম বহ্নি অপেক্ষা কম স্থানে থাকে আর বহ্নি ধূম অপেক্ষা বেশি স্থানে থাকে। ধূম থাকলে সেখানে বহ্নি থাকে। কিন্তু বহ্নি থাকলে সেখানে ধূম থাকবেই—এমন নয়। ধূম না থাকলেও বহ্নি থাকতে পারে। যেমন, তপ্ত লৌহপিণ্ড। এজন্য, ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করা গেলেও বহ্নি দেখে ধূমের অনুমান করলে তা সকল সময়ে বৈধ হয় না।

৮.২৩. ব্যাপ্তিগ্রহ বা ব্যাপ্তি নির্ণয়ের উপায় (ব্যাপ্তি-প্রতিষ্ঠা)
(Vyāptigraha or method of establishing vyāpti)

ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের ভিত্তি। দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ সামান্য বচনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রশ্ন হল ঃ কিভাবে এই ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ—এই সামান্য বচন প্রতিষ্ঠা করা যায়? ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে জানি যে, যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি? কিভাবে জানি—সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান? ন্যায় মতে, ব্যাপ্তি নির্ণয়ের প্রণালী আছে এবং তা হল **অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ, উপাধিনিরাস, তর্ক ও সামান্যলক্ষণ-প্রত্যক্ষ**।

অন্বয় ঃ দুটি বিষয়ের একত্র উপস্থিতি হল অন্বয়। দুটি বিষয়ের অন্বয় বা একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করে জানা যায় যে, সে-দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে। যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি। পাকশালা (রান্নাঘর), গোশালা, যজ্ঞবেদী প্রভৃতি স্থানে ধূম থাকে, বহ্নিও থাকে। এসব ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির একত্র উপস্থিতি বা অন্বয় লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।

ব্যতিরেক ঃ দুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতি হল ব্যতিরেক। দুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতি বা ব্যতিরেক লক্ষ্য করে জানা যায় যে, সে-দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। যেখানে বহ্নি নেই সেখানে ধূমও নেই। নদীতে, হ্রদে, সমুদ্রে বহ্নি নেই, ধূমও নেই। এসব ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নির একত্র অনুপস্থিতি বা ব্যতিরেক-সম্বন্ধ থেকে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।

অন্বয় ও ব্যতিরেকের যুগ্ম-প্রণালীর মাধ্যমেও ব্যাপ্তি নির্ণয় করা যায়। যেখানে ধূম আছে সেখানে বহ্নি আছে, আর যেখানে বহ্নি নেই সেখানে ধূমও নেই—ধূম ও বহ্নির এমন সম্বন্ধ লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। এই যুগ্ম-প্রণালী পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানী মিল (Mill) -এর অন্বয়-ব্যতিরেক পদ্ধতির (Joint Method of Agreement and Difference) -সঙ্গে তুলনীয়।

ব্যভিচারাগ্রহ ঃ ব্যভিচার-অগ্রহ দ্বারাও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। 'ব্যভিচার' বলতে বোঝায় 'বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত', আর 'অগ্রহ' বলতে বোঝায় 'অদর্শন' বা দেখতে না পাওয়া। কাজেই 'ব্যভিচারাগ্রহ' বলতে বোঝায়, 'বিপরীত বা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তের অভাব।' যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি; ধূম আছে কিন্তু বহ্নি নেই—এমন বিপরীত দৃষ্টান্তের কোন নজির নেই। কাজেই, ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে বলে আমরা জানি।

উপাধিনিরাস ঃ 'উপাধি' বলতে বোঝায় 'শর্ত'। কাজেই 'উপাধিনিরাস' কথার মানে 'শর্ত-নিরাস' বা 'শর্ত-নিরসন'। শর্ত বা উপাধি থাকলে ব্যাপ্তি হয় না। ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য তাই উপাধির নিরাস প্রয়োজন। ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে উপাধি বা শর্তকে নিরসন করতে হবে, অর্থাৎ বাদ দিতে হবে। বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ শর্তাধীন বা উপাধিযুক্ত। বহ্নি থাকলে সেখানেই ধূম থাকে, সেখানে কাঠ বা ইন্ধন ভিজে। ভিজে কাঠের বহ্নি থেকেই ধূম হয়। যে কাঠ ভিজে নয় তার বহ্নি থেকে ধূম নির্গত হয় না। তপ্ত লৌহপিণ্ডে আর্দ্রতা থাকে না বলে সেখানে বহ্নি থাকলেও ধূম থাকে না। বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ শর্তযুক্ত বলে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে বলা যাবে না। কিন্তু ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ উপাধিশূন্য বা নিরুপাধিক বলে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে।

তর্ক ঃ চার্বাকের মতো সংশয়বাদীরা যদি ব্যাপ্তি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন, তাহলে তর্কের মাধ্যমে তাঁদের সংশয় দূরীভূত করে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায়। সংশয়বাদীরা এমন বলতে পারেন যে, অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ প্রভৃতি প্রণালীর দ্বারা যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় তা যথার্থ নয়, কেননা সেই সম্বন্ধ যে ভবিষ্যতেও সত্য হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এঁদের মতে, ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ তা যে ভবিষ্যতেও থাকবে, এমন নিশ্চয়তা নেই—ভবিষ্যতে বহ্নি ছাড়াই ধূম থাকতে পারে।

সংশয়বাদীদের সংশয় নিরাশের জন্য নৈয়ায়িকগণ 'তর্কের' সাহায্য গ্রহণ করেন। এখানে 'তর্ক' অর্থে **'আরোপ'**—বিপরীত জ্ঞানের আরোপ। কোন প্রমাণের সাহায্যে (যেমন—অনুমান প্রমাণের সাহায্যে) যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্তের বিরোধী সিদ্ধান্ত আরোপ করে দেখানো হয় যে ঐ বিরোধী সিদ্ধান্তটি মিথ্যা এবং ফলত মূল সিদ্ধান্তটি সত্য। **অর্থাৎ প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরোধী সিদ্ধান্ত যে অসম্ভব এটা দেখানোর জন্য যেসব যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাকেই বলে 'তর্ক'।** ব্যাপ্তি-প্রতিষ্ঠায় নৈয়ায়িকগণ এপ্রকার তর্কের (অরোপিত বাক্যের) আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা বলেন, 'সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান' এই ব্যাপ্তিবাক্যটি সত্য না হলে তার বিরুদ্ধ

বাক্য 'কোন কোন ধূমবান বস্তু নয় বহ্নিমান' (A বচনের বিরুদ্ধ বচন O এবং এই দুটি বিরুদ্ধ বচন একসঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না) অবশ্যই সত্য হবে। কিন্তু এমন বলার অর্থ হল 'কারণ ছাড়াই কার্য থাকতে পারে'—একথা স্বীকার করা; কেননা আমরা জানি যে ধূম ও বহ্নির ক্ষেত্রে বহ্নি (সাধ্য) ধূমের (হেতুর) কারণ। যাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে তারা কার্যকারণ ভাবাপন্নই হয়। কিন্তু কারণ ছাড়া কার্য হয় না—এটাই সর্বজনস্বীকৃত। ধূম সৃষ্টি করতে হলে সেখানে বহ্নি সৃষ্টি করতে হয়। ধূমপানের প্রয়োজন হলে বহ্নিসৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এভাবে, তর্কের মাধ্যমে নৈয়ায়িকরা হেতু (ধূম) ও সাধ্যের (বহ্নির) মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিপাদন করেন।

সামান্যল(ণ-প্রত্য(ঃ নৈয়ায়িকদের মতে, যদিও অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ ইত্যাদির দ্বারা ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তর্কের দ্বারা সেই সম্বন্ধ সমর্থিত হয়, তথাপি **একমাত্র সামান্যলক্ষণ-প্রত্যক্ষের মাধ্যমেই ব্যাপ্তিজ্ঞান যথার্থ হতে পারে।** ন্যায় মতে, আমরা যেমন বিশেষ বস্তু প্রত্যক্ষ করি তেমনি ঐ বিশেষে সামান্য ধর্মও প্রত্যক্ষ করি। আমরা যখন বিশেষ স্থানে ধূম ও বহ্নি প্রত্যক্ষ করি তখন সেই ধূম-বিশেষে ধূমত্ব-সামান্য ও বহ্নি-বিশেষে বহ্নিত্ব-সামান্যও প্রত্যক্ষ করি। ধূমত্ব প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সর্বকালের ধূমের ও বহ্নিত্ব প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সর্বকালের বহ্নির অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয় এবং এর ফলে সর্বকালের ধূমের সঙ্গে সর্বকালের বহ্নির সম্বন্ধও প্রত্যক্ষ হয়। এরূপ সর্বকালের ধূম ও বহ্নির অলৌকিক প্রত্যক্ষের ফলেই ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ যথার্থ হয় এবং আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে সমর্থ হই যে, 'সকল ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান'।

৮.২৪. অনুমানের শ্রেণীবিভাগ (Classfication of Inference)

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান ঃ 'অনুমান কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করে'—এই দিক থেকে নৈয়ায়িকগণ অনুমানকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

১। **স্বার্থানুমান** এবং

২। **পরার্থানুমান বা পঞ্চ-অবয়বী অনুমান।**

১। স্বার্থানুমান ঃ নিজের জ্ঞানলাভের জন্য যে অনুমান, তা স্বার্থানুমান। অনুমানের বচনকে **'অবয়ব'** বলে। স্বার্থানুমানে তিনটি বচন বা অবয়ব থাকলেই চলে। এই কারণে স্বার্থানুমানকে **'ত্রি-অবয়বী অনুমান'** বলে। তিনটি বচনের মধ্যে দুটি হেতুবাক্য, তৃতীয়টি সিদ্ধান্ত। পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করে, ধূমের সঙ্গে বহ্নির ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ স্মরণ করে, কোন ব্যক্তি পর্বতে বহ্নির অনুমান করতে পারে। এরূপ স্বার্থানুমানের আকারটি হল ঃ

পর্বতটি বহ্নিমান,
যেহেতু পর্বতটি ধূমবান এবং
যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি।

২। পরার্থানুমান ঃ ন্যায়দর্শনে 'অনুমান' বলতে সাধারণত পরার্থানুমানকেই মনে করা হয়, কেননা পরার্থানুমানের গঠনপ্রণালী রীতিসম্মত। **পরার্থ-অনুমান হল 'অপরের জন্য অনুমান'।** ধূম দেখে বহ্নি অনুমান করার পর যখন কোন ব্যক্তি সেই অনুমানলব্ধ জ্ঞানকে অপরের মনে সঞ্চারিত করতে চান, তখন তা হয় **পরার্থানুমান।** এই প্রকার অনুমানের পাঁচটি বচন বা অবয়ব থাকে বলে একে **'পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়'** বলে। পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব হল—

(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় এবং (৫) নিগমন।

পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রতিজ্ঞা—পর্বতটি বহ্নিমান

(২) হেতু—যেহেতু পর্বতটি ধূমবান

(৩) উদাহরণ—যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যথা—পাকশালা

(৪) উপনয়—বহ্নিব্যাপ্যধূম ঐ পর্বতে আছে

(৫) নিগমন—অতএব পর্বতটি বহ্নিমান।

পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়; এরা পরস্পর সংযুক্ত বাক্য। অর্থাৎ পঞ্চ-অবয়বী ন্যায় পাঁচটি অঙ্গবাক্য দ্বারা গঠিত একটি মহাবাক্য। এই পরস্পর সংযুক্ত বাক্যগুলি শুনে শ্রোতা, যার পর্বতে বহ্নি সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না, পর্বতে বহ্নিব্যাপ্য-ধূম আছে জেনে 'পর্বতে বহ্নি আছে',—এমন জ্ঞান লাভ করে। বক্তা পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের দ্বারা শ্রোতাকে সিদ্ধান্তে 'নীত' করেন। বক্তা নিজে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, শ্রোতাকেও পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের মাধ্যমে সেই সিদ্ধান্তে 'নীত' করেন।

পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের **প্রথম বাক্যটি প্রতিজ্ঞা**। যা প্রতিপাদন করতে হবে সেটাই প্রতিজ্ঞাবাক্যে ব্যক্ত করা হয়। বক্তার মনে যে জ্ঞানের উদয় হয়েছে, প্রতিজ্ঞাবাক্যে তিনি সেটাই শ্রোতার কাছে উপস্থিত করেন। পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ের লক্ষ্য হল, বক্তার মনে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে শ্রোতার মনে সেই জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানো। অনুমানের প্রতিপাদ্য হল, পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধ নির্দেশ করা। প্রতিজ্ঞাতে বক্তা সেটাই শ্রোতাকে বলেন। যেমন—

'পর্বতটি বহ্নিমান।'

এখানে পর্বত 'পক্ষ' আর বহ্নি 'সাধ্য'।

বক্তার কাছে প্রতিজ্ঞাবাক্যটি প্রমাণিত হলেও শ্রোতার কাছে তা প্রতিষ্ঠিত নয়। এজন্য, প্রতিজ্ঞাবাক্যটি শুনে শ্রোতা প্রশ্ন করতে পারেন—— 'এমন কথা বলার হেতু কি'? এরূপ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্যই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পর **দ্বিতীয় বাক্য 'হেতুবাক্যে'র উল্লেখ করতে হয়** ঃ

'যেহেতু পর্বতটি ধূমবান'।

বচনটিতে 'পক্ষধর্মতাজ্ঞান' অর্থাৎ পক্ষতে হেতুর (পর্বতে ধূমের) অবস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে, যা অনুমানের অত্যাবশ্যক শর্ত।

কিন্তু 'হেতু'র উল্লেখ করা হলেও শ্রোতার মনে পর্বতের বহ্নি সম্পর্কে সংশয় দূরীভূত না হতেও পারে এবং সে বক্তাকে বলতে পারে—'তাতে কি? ধূম ও বহ্নি তো এক নয়। ধূম দর্শনে তাই বহ্নির জ্ঞান সঠিক নাও হতে পারে।' শ্রোতার এইরূপ সন্দেহ দূরীকরণের জন্যই **তৃতীয় বাক্য 'উদাহরণের'** প্রয়োজন ঃ

'যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যেমন—পাকশালা'।

উদাহরণ বাক্যটিই ব্যাপ্তিবাক্য। ধূম থাকলেই যে বহ্নি থাকে, ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে—একথাই উদাহরণ বাক্যে বলা হয় এবং তা বলা হয় একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, যথা—পাকশালা'।

পঞ্চ-অবয়বী মহাবাক্যের এই তৃতীয় বাক্যটির অর্থাৎ 'উদাহরণের' একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য

আছে। এটি একটি সামান্য বাক্য এবং বাক্যটির কেবল আকারগত সত্যতা নেই, বস্তুগত সত্যতাও আছে। বাক্যটির যে বস্তুগত সত্যতা আছে তা দেখান হয় দৃষ্টান্তটির (পাকশালা) মাধ্যমে। উদাহরণ বাক্যটি আসলে একটি আরোহ অনুমানের ফল ঃ পাকশালা, গোশালা, যজ্ঞশালা ইত্যাদি স্থানে ধূম ও বহ্নি একত্র লক্ষ্য করে উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ নির্ণয় করে বলা হয়—'যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি'। তৃতীয় অঙ্গবাক্যটির এই বৈশিষ্ট্য (বস্তুগত সত্যতা) এটাই নির্দেশ করে যে, **পঞ্চ-অবয়বী ন্যায় যুগপৎ অবরোহী ও আরোহী।**

কিন্তু তৃতীয় বাক্য বা 'উদাহরণ' শ্রবণ করেও শ্রোতার মনে পর্বতে বহ্নির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান হয় না; কেননা—'উদাহরণে' যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে তা পাকশালার ধূম ও বহ্নি। পাকশালার ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ থাকতে পারে। কিন্তু পর্বতের ধূম যে পাকশালার ধূমের মতো, পর্বতের বহ্নি যে পাকশালার বহ্নির মতো —এমন না জানলে পর্বতে ধূম দেখে সেখানে বহ্নির অনুমান করা যায় না। একারণে **চতুর্থ বাক্য অর্থাৎ 'উপনয়ের'** প্রয়োজন হয় ঃ

'বহ্নিব্যাপ-ধূম ঐ পর্বতে আছে।'

অর্থাৎ পর্বতটিতে, পাকশালার ন্যায় বহ্নিব্যাপ্য-ধূম আছে। **এই বাক্যটি ভারতীয় ন্যায়কে এক বিশিষ্টতা দিয়েছে।** পাশ্চাত্য ন্যায়ের সিদ্ধান্তে 'পক্ষ' ও 'সাধ্যের' মধ্যে সম্বন্ধ 'হেতু'র মাধ্যমে দেখান হয়,—পক্ষ ও সাধ্যের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু ভারতীয় পঞ্চ-অবয়বী ন্যায়ে, উপনয়বাক্যে পক্ষ, হেতু ও সাধ্য তিনটিই উপস্থিত থাকে বলে সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা **প্রত্যক্ষভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনয় বাক্যটি আসলে 'হেতুবাক্য' ও 'উদাহরণ' বাক্যের মিলিত ফল।**

এই বাক্যটিকে অর্থাৎ উপনয়কে 'লিঙ্গ-পরামর্শও' বলা হয়। এই বাক্যটি শুনে শ্রোতার মনে 'পরামর্শ' উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সে স্মরণ করে যে, পর্বতে যে ধূম দেখা যায় তার সঙ্গে বহ্নির ব্যাপ্তি-যোগ আছে। এই অবস্থায়, পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (বহ্নির) অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রোতার মনে আর কোন সংশয় থাকে না, এটা উপলব্ধি করে বক্তা **পঞ্চম বাক্য 'নিগমন'** প্রয়োগ করেন ঃ

'অতএব পর্বতটি বহ্নিমান।'

এই বাক্যটি প্রথম বাক্য প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি নয়। প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমনবাক্য আকারে এক হলেও তাদের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিজ্ঞায় যা ছিল অপ্রমাণিত, নিগমনে তা প্রমাণিতরূপে উপস্থিত। প্রতিজ্ঞা প্রাক্-কল্পনা-স্বরূপ, নিগমন প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান। একারণে নিগমনে 'অতএব' শব্দটি যুক্ত হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ও উপনয়—এই চারটি পরস্পর-সংযুক্ত বাক্যের ওপর নির্ভর করে নিগমন বা সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হওয়ায় 'অতএব' শব্দটি যুক্ত হয়। শ্রোতার কাছে এখন আর পর্বতে সাধ্য-ধর্ম (বহ্নি) সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। শ্রোতার এখন এমন জ্ঞান হয় যে, পক্ষতে সাধ্যধর্ম বর্তমান, অর্থাৎ 'ধূমবান পর্বতটি বহ্নিমান'।